PAPER CUTTING MAY 2023

সম্পাদকীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

WBCS Bengali Compulsory Paper

9000+ WBCS aspirants

জুড়ে আছে আমাদের সঙ্গে ।

WHATSAPP -7047352328

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Arsenic contamination বিষের বিপদ

অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক সংক্রমিত ভূগর্ভস্থ জলের কারণে নানাবিধ দুরারোগ্য রোগের কথা আগেই জানা ছিল। সাম্প্রতিক এক গবেষণা জানাচ্ছে, অল্পবয়সিদের মস্তিষ্কের বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে স্বল্পমাত্রার আর্সেনিকের উপস্থিতিও। ফলে, লিটার প্রতি আর্সেনিকের মাত্রা ১০ মাইক্রোগ্রামের কম হলে তা বিপদসীমার নীচে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এ-হেন মাপকাঠিকে পুনর্মূল্যায়নের মুখে ঠেলে দিয়েছে এই গবেষণা। আর্সেনিক-সমৃদ্ধ হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলির কারণে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমতল এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশে ভূগর্ভস্থ জলে উচ্চমাত্রার আর্সেনিক থাকার সতর্কবার্তা বহু দিন ধরেই দিয়ে আসছেন বিজ্ঞানীরা। এর ফলে চর্মরোগ এবং ক্যানসার হওয়ার কথা বিভিন্ন সময়ে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি মেক্সিকো, কম্বোডিয়া এবং আমেরিকার গবেষণায় মস্তিষ্ক প্রভাবিত হওয়ার কথাও জানা গিয়েছে।তাই, পরিস্থিতি উদ্বেগের। বিশেষত, যেখানে আর্সেনিকের তাৎক্ষণিক কোনও প্রভাব বোঝা যায় না। মনে রাখতে হবে, ভবিষ্যতে শিশুর মানসিক গঠন কেমন হবে, তা নির্ধারিত হয়ে যায় পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই। যদিও জিনগত এবং পরিবেশগত— এই দু'টি বিষয়ের প্রভাব থাকে মানসিক গঠনের উপরে। উক্ত গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মস্তিষ্কের ধূসর অংশ প্রভাবিত হয় আর্সেনিকের কারণে। পরিবর্তন ঘটে এর গঠনে। প্রভাব পড়ে এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংযোগ স্থাপনে। ফলে, মনোযোগ, বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, শিক্ষার মতো হরেক কাজ বিঘ্নিত হয়। তাই মস্তিষ্কের বিকাশের ত্রুটিতে জিনের পাশাপাশি যে পরিবেশ দূষণকারী উপাদানও দায়ী, তা অনেকাংশে স্পষ্ট গবেষণায়। এবং, এ ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে আর্থসামাজিক পরিস্থিতিও। আর্সেনিক দূষিত জল জমিতে থাকলে ধান গাছ অতি দ্রুত সেই আর্সেনিক টেনে নেয়। আর্সেনিক অধ্যুষিত এলাকায় অগভীর নলকূপের জল চাষে ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি সেই জলেই ধান সিদ্ধও করা হয়। দূষিত জল থেকে আর্সেনিক ঢুকে পড়ে চালের মধ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চাল বিক্রি হয় দূরবর্তী স্থানেও। ফলে যে সব এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলে বিপজ্জনক মাত্রার আর্সেনিক নেই, সেখানেও মানুষ পরোক্ষ আর্সেনিক দূষণের শিকার হন। তবে শুধু চাল নয়, আনাজ, মাংস, দুধ ও মাছের মতো দৈনন্দিন খাবারের মাধ্যমেও এই বিষ ঢুকছে মানবদেহে। অর্থাৎ, আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা থাকছে খাদ্যাভ্যাসের। ফলে, একটা দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়ার মধ্যে যে আমরা ইতিমধ্যেই রয়েছি, এই গবেষণাটি তারই ইঙ্গিতবাহী।

ইঙ্গিত স্পষ্ট— আর্সেনিকের মতো দূষণ উপাদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিপদসীমা বলে কিছু হয় না। তাই নতুন ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। কারণ, প্রশাসনের সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে চালের মতো খাদ্যসামগ্রী বিতরণ জনসাধারণ, বিশেষত শিশু ও অল্পবয়সিদের মধ্যে এই বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা বাড়াবে, যা একমাত্র হ্রাস করা সম্ভব খাদ্যাভ্যাস বদলে। সেই সঙ্গে চাষে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার বহুলাংশে কমিয়ে বাড়াতে হবে সেচের জলের ব্যবহার। আর্সেনিক দূষণ এ রাজ্যের এক দীর্ঘকালীন জনস্বাস্থ্য সঙ্কট। সমস্যার নিরসনে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে সরকারকে। আগামী প্রজন্মের ভাল থাকা অনেকটাই নির্ভর করবে এর উপর।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

WHATSAPP -7047352328

*New Parliament Building*নবভারত চিত্রকথা

এখন অষ্টপ্রহর জুড়ে কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়। নাগরিকের বিস্ফারিত নয়নের সম্মুখে চলতে থাকে তাদের অবিরত প্রদর্শনী। তবে কোনও কোনও দিন তার মধ্যেও বিশেষ। যেমন গত রবিবার। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে রাজধানীতে সে দিন যে দৃশ্যগুলির জন্ম হল, প্রধানমন্ত্রী কথিত 'নতুন ভারত'-এর সচিত্র জীবনকাহিনিতে তাদের জন্য অবশ্যই পাকা জায়গার বন্দোবস্ত হবে। দাক্ষিণাত্যের মন ওরফে ভোট পাওয়ার কৌশল হিসাবে আবিষ্কৃত রাজদণ্ড হাতে নরেন্দ্র মোদীর সাড়ম্বর গজেন্দ্রগমন, মন্ত্রোচ্চারণ সহযোগে যজ্ঞানলে ভৃষ্টধান্য বা খদিকা (খই) অঞ্জলি, বক্তৃতার সূচনায় 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি প্রক্ষেপণ ইত্যাদি অষ্টোত্তর শতচিত্রকে অতিক্রম করে যে ছবিটি সম্ভবত সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছে এবং হয়ে চলবে, সেটি সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সেঙ্গোলের সামনে লাল গালিচায় তাঁর সাষ্টাঙ্গ প্রণামের দৃশ্য। ২০১৪ সালেও সংসদ ভবনে মহাপ্রবেশের মুহূর্তে তিনি একই মুদ্রায় প্রণিপাত করেছিলেন। কিন্তু পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। প্রচার-প্রাজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী বিলক্ষণ জানেন, সহস্রচক্ষু প্রযুক্তির এই স্বর্ণযুগে এমন দৃশ্য এক লহমায় তাঁর এক হাজার মন কিবাত-এর কাজ করে দেবে, দিকে দিকে সাধুবাদ উচ্চারিত হবে: অহো! গণতন্ত্রের প্রতি দুনিয়ার বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের অধিনায়কের কী সুগভীর, সম্পূর্ণ, সাষ্টাঙ্গ শ্রদ্ধা!

কিন্তু রাজদণ্ড তো রাজার দণ্ড, তাঁর ক্ষমতার প্রতীক। গণতন্ত্রে তার স্থান কোথায়? সুকুমার রায়ের নেড়া বলত, ওই শিশিবোতলের জায়গাটা একটু কঠিন বটে। ভারতের স্বাধীনতা তথা ক্ষমতা হস্তান্তরের ইতিহাসে সেঙ্গোলের ভূমিকা এবং পরবর্তী কালে তার প্রতি নেহরু ও তাঁর উত্তরসূরিদের 'উপেক্ষা'র কথা ও কাহিনি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর সওয়াল-জবাব শোনা গিয়েছে, কিন্তু সেই বিতর্কের ঘোলা জলে অবগাহন না করেও একটি কথা বুঝে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। অতীতে যা-ই ঘটে থাকুক, একুশ শতকের তৃতীয় দশকে গণতান্ত্রিক ভারতের আইনসভার নবনির্মিত পরিসরে রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। এই প্রয়োজন গণতন্ত্রের নয়, দেশবাসীরও নয়, রাজদণ্ড ফিরে এসেছে শাসকের নিজস্ব প্রয়োজনে। এবং তা নিছক তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে পা রাখার প্রয়োজন নয়, গণতান্ত্রিক বাতাবরণে রাজাধিরাজের আধিপত্য ও মহিমাকে প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন। সংসদ ভবন উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতির স্বাভাবিক ভূমিকা থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ সরিয়ে রেখে যে ভাবে সমগ্র আয়োজনটিকে কার্যত প্রধানমন্ত্রীর একক অনুষ্ঠানে পরিণত করা হল এবং রাষ্ট্রপতির বিবৃতিতে সেই প্রক্রিয়াকেই যথাযথ বলে শংসাপত্র দেওয়া হল, তা জানিয়ে দেয়, এই 'নতুন ভারত' পোশাকে ও অঙ্গসজ্জায় গণতন্ত্রকে প্রণাম করে আপন মজ্জায় মজ্জায় যে নীতি ও আদর্শকে বরণ করে নিতে বদ্ধপরিকর, তার নাম নায়কতন্ত্র।

সেই তন্ত্র সাধনার প্রকরণ হিসাবে হিন্দুত্ববাদকে কব্জি ডুবিয়ে ব্যবহার করবার যে রীতি এই শাসকরা পালন করে চলেছেন, রবিবারের আয়োজনটি ছিল তারও এক অভূতপূর্ব প্রদর্শনী। বিভিন্ন ধর্মের প্রার্থনা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রভাতী অনুষ্ঠান রাখতে আয়োজকরা ভোলেননি, কিন্তু সংসদ ভবনের মূল পর্বটি এমন ভাবে আপাদমস্তক ধর্মীয় আচারে পরিপূর্ণ যে তাকে কোনও আধুনিক মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান বলে বিভ্রম ঘটবার যথেষ্ট কারণ আছে। বস্তুত, এই 'বিভ্রম'কে সত্য করে তোলাই বোধ করি শাসকদের প্রকৃত লক্ষ্য। হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সেই লক্ষ্য পূর্ণ করতে চান তাঁরা। জন্মমুহূর্তেই নতুন সংসদ ভবনকে তার সাধনভূমি রূপে চিহ্নিত করা হল। দেশবাসী এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা যথার্থ গণতন্ত্রের সাধনার মধ্য দিয়ে শাসকদের এই উদ্যোগকে প্রতিহত করতে পারবেন কি না, ইতিহাস তা বলবে। সংসদ ভবন হবে সেই ইতিহাসের এক পরীক্ষাগার। নিছক পরীক্ষা নয়, অগ্নিপরীক্ষা।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Transgender Rights অন্য লড়াই

সাদা চোখে যা কিছু ‘স্বাভাবিক’ নয়, তাকে দূরে ঠেলা, তার প্রতি হিংস্রতার প্রবণতা এ সমাজের মজ্জাগত। এর মধ্যেই কিছুটা আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখল সাম্প্রতিক কালের স্মরণ্যার ঘটনাটি। স্মরণ্যা ঘোষ এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন। তিনি রূপান্তরকামী। অর্থাৎ, সমাজ এ-যাবৎ কাল ‘স্বাভাবিকত্ব’-এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করে এসেছে, স্মরণ্যা তার ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম বলেই স্মরণ্যার লড়াইটিও সহজ ছিল না। সেই লড়াইয়ের প্রথম ধাপটিতে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ। তাঁকে একাকী লড়তে হয়নি, পরিবার তো বটেই, তাঁর সামাজিক গণ্ডির মধ্যে থাকা মানুষরাও মানসিক ভাবে তাঁর ও তাঁর পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে ‘নিজের মতো করে’ বড় হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

শুধু স্মরণ্যা নয়, সদ্য-পালিত জামাইষষ্ঠীর দিনটিতে সমকামী যুগলকে সাদরে বরণ করছেন পরিবারের মানুষজন— এমন দৃশ্যও তো ধরা পড়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁদের বিবাহে সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন পাড়া-প্রতিবেশী। কোনও একটি পরিচয়ে যাঁরা ‘সংখ্যালঘু’, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্রোত স্বেচ্ছায় আপন করে নেবে, একটি পরিচিতির ব্যবধানকে অন্য পরিচিতির একতার উপরে বিভেদ বা প্রত্যাখ্যানের ছায়া ফেলবে না, যে কোনও প্রগতিশীল সমাজের এই শর্ত অনুসরণ করে চলা বিধেয়। বাস্তব বলে, যাঁরা লিঙ্গ-পরিচয়ে, সম্পর্কের বন্ধনে পৃথক, ‘সংখ্যালঘু’— তাঁদের প্রতি পদে এক অবিশ্বাস্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধার প্রাচীর অতিক্রম করতে হলে শুধুমাত্র পরিবারের পাশে থাকাই যথেষ্ট নয়। সমাজকেও সচেতন সমমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। ২০১৮ সালে যখন সুপ্রিম কোর্টে ৩৭৭ ধারাটির অবলুপ্তি ঘটেছিল, তখন সমকামী, রূপান্তরকামী এবং নানাবিধ ভিন্ন যৌন-চেতনার ব্যক্তিরা (এলজিবিটিকিউএআই) ‘অপরাধী’ তকমা থেকে মুক্তি পান। কিন্তু, আদালতের রায় এক কথা, সমাজের রায় আর এক। পূর্বের তুলনায় সচেতনতা হয়তো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক পরিবারই সন্তানের ‘অন্য’ রকম হওয়াকে অসুখ মনে করে। এবং তাঁদের অবসাদ ক্রমশ সন্তানকেও গ্রাস করে। অনেকের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা যায়। এর পশ্চাতে সামাজিক চাপের ভূমিকাটি অন্যতম। এই কারণেই উপরোক্ত ঘটনা দু’টি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। শুধু মেনে নেওয়া নয়, এই উদাহরণগুলিতে ভিন্ন যৌনতা, ভিন্ন লিঙ্গচয়নকে ‘স্বাভাবিক’ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই মানসিকতাকে কুর্নিশ।

তবে, এখনও বহু পথ চলা বাকি। কিছু দিন পূর্বে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের এক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, রূপান্তরকামী পরিচয়ে স্বচ্ছন্দ ছোটদের ৭৩.৬ শতাংশ বাড়িতে নিরাপদ বোধ করে না। ৬২.৫ শতাংশ স্কুলে অস্বস্তিতে ভোগে। এই পরিসংখ্যান স্বস্তিদায়ক নয়। বছর দুয়েক আগে মাদ্রাজ হাই কোর্ট এক রায়ে জানিয়েছিল, চিকিৎসকের সহায়তায় সমকামী ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার উদ্যোগ অপরাধ। তাঁরাও আর সকলের মতোই ‘স্বাভাবিক’। সুতরাং, সচেতনতা তৈরি করে, আইন প্রণয়ন করে তাঁদের মূলধারায় নিয়ে আসা জরুরি। ‘অপর’ যৌনতার মানুষকে স্বাভাবিক বলে স্বীকারের প্রক্রিয়াতেই তাঁরা সমাজের মূলস্রোতে প্রবেশ করতে পারবেন। বিচ্ছিন্ন ভাবে সমাজের মধ্যেই সেই উদ্যোগ শুরু হয়েছে। অন্যদেরও সেই পথ অনুসরণ করা উচিত।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

WHATSAPP -7047352328

Fire Cracker Factory প্রাণের মূল্যে

এগরা, বজবজ, ইংরেজ বাজারে অবৈধ বাজি কারখানার দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারালেন, তাঁদের মৃত্যুর জন্য দায়ী যতটা বিস্ফোরক, ততটাই দায়ী বেকারত্ব, কর্মহীনতা। বিশেষত এগরার বাজি কারখানাটিতে একাধিক বিস্ফোরণের ইতিহাস জানা থাকা সত্ত্বেও গ্রামের মেয়েরা কাজ করতে যেতেন, তার কারণ জীবনধারণের বিকল্প উপায় তাঁরা খুঁজে পাননি। অনেকেই কারখানার মালিক কৃষ্ণপদ বাগের কাছে ঋণ নিয়ে শোধ করতে পারেননি, তাই তাঁর কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁদের 'বেতন' থেকে পরিশোধ হচ্ছিল ঋণ। অতএব পুলিশ-প্রশাসনের নাকের ডগায় কী করে বাজি কারখানা চলছিল, এটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়, আরও বড় প্রশ্ন হল, গ্রামে রোজগারহীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছল কী করে, যাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামবাসী? কেন বাংলার গ্রামে গ্রামে পুরুষ-মহিলা-শিশু এমন মালিক-ঠিকাদারদের কাছে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করছেন, যাঁরা কার্যত মাফিয়া? কৃষ্ণপদ বাগের মতো মানুষ বাংলার একটি রাজনৈতিক শ্রেণির প্রতিনিধি, যাঁরা আইনের শাসনকে পরাভূত করে, হিংসা ও উৎপীড়নের জোরে এক-একটি অর্থকরী ক্ষেত্রকে কুক্ষিগত করেছেন। কখনও তা কারখানা, কখনও খাদান, বালিয়াড়ি বা ভেড়ি। এলাকার মানুষ প্রাণ হাতে নিয়ে কাজে নামতে বাধ্য হচ্ছেন, তার কারণ এলাকায় আর কোনও কাজ নেই। বাজিতে নিহতদের পরিজন গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনার অধীনে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য আক্ষেপ করেছেন সাংবাদিকদের কাছে।

রাষ্ট্র কাজের অধিকার দিয়েছে নাগরিককে, অথচ কেন্দ্র ও রাজ্য পরস্পর সংঘাতে সেই কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে পশ্চিমবঙ্গকে— এ হল আক্ষেপের কথা। ভয়ের কথা এই যে, সরকারি প্রকল্পের কাজটুকুই বহু গ্রামবাসীর কাছে রোজগারের একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছে। কৃষি, শিল্প, পরিষেবা, কোনও ক্ষেত্র থেকেই গ্রামে নিয়মিত রোজগার মিলবে না, এটাই যেন সকলে ধরে নিয়েছেন। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ রোজগারের আশায় হয় ভিনরাজ্যে চলেছেন, না হলে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে যে কোনও শর্তে, যে কোনও কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। খাওয়া-পরার খরচ মেটাতে ঋণ নেওয়া, এবং প্রায় মিনিমাগনা খেটে তা শোধ দেওয়া, এ হল 'দাসশ্রম'-এর পরিস্থিতি। এমন অবস্থায় মালিক বা ঠিকাদার যে কাজে নিয়োগ করেন, যা কিছু নির্দেশ দেন, তা মেনে নিতে বাধ্য হন শ্রমিকরা। দুর্ঘটনায় প্রাণ যাবে, দূষণে অসুখ হবে, পুলিশ জেলে ভরবে, জেনেও শ্রমিকরা অসহায়। ফল অঙ্গহানি, মৃত্যু, কখনও কারাদণ্ড, দাগি পরিচয়ে বেঁচে থাকা। অসংগঠিত, অবৈধ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যুগুলির অধিকাংশই নথিভুক্ত হয় না, তাই শোরগোলও পড়ে না। এগরা, বজবজের ছিন্নভিন্ন দেহের বীভৎসতা সে দিকে তাকাতে বাধ্য করল।

গ্রামে কাজের সুযোগের অভাব বলেই ছোট-বড় অবৈধ কারখানা, ভেড়ি, ভাটা, বা খাদানে কখনও শ্রমিকের জোগানে অভাব হয়নি। আজও সে ভাবেই কর্মী জোগাড় হচ্ছে। পঁচাত্তর বছরের গণতন্ত্র সে প্রথায় কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি, তা বুঝিয়ে দিচ্ছে রাজ্যজোড়া অবৈধ বাজির কারখানা। আজ রাজ্য সরকারকে নতমস্তকে স্বীকার করতে হবে, কেবল অনুদানের প্রকল্প দিয়ে দারিদ্র কমে না। গ্রামীণ মজুরি কমছে, অথচ খাবার-সহ সব জরুরি জিনিসের দাম বাড়ছে— এই ভয়ানক পরিস্থিতির মোড় ঘোরানোর জন্য উপযুক্ত সরকারি নীতি চাই। চাষকে লাভজনক করতে ফড়েদের নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ, তৃণমূল স্তরে শূন্য পদে সরকারি কর্মী নিয়োগ— উপায়গুলি অজানা নয়। সে সব কর্তব্য এড়িয়ে, আইনের শাসনকে শিথিল করে 'মানবিক' মুখ দেখাতে চান নেতারা। খাওয়া-পরার সংস্থান করছে, এই অজুহাতে অবৈধ ক্ষেত্রকে ছাড় দিলে গরিব আরও বিপন্ন হয়। রাজনীতি ও প্রশাসনকে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে।

Malaria and Dengue Cases ধারাবাহিক বিপদ

কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আর আপৎকালীন অবস্থা নয়— বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই ঘোষণা যখন বিশ্ববাসীর কাছে আশ্বাসবাণী বয়ে আনছে, ঠিক সেই সময়ই ভারতে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার চিত্রটি এ দেশের জনগণ এবং প্রশাসনের সবিশেষ অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। ওয়ার্ল্ড ম্যালেরিয়া রিপোর্ট ২০২১ অনুসারে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মোট ম্যালেরিয়া আক্রান্তের মধ্যে ৮৩ শতাংশ এবং ম্যালেরিয়ার কারণে মোট মৃত্যুর সংখ্যার মধ্যে ৮২ শতাংশই ভারতে ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের ছবিটি ঠিক একই রকম বিবর্ণ। ‘ন্যাশনাল ভেক্টর-বোর্ন ডিজ়িজ় কন্ট্রোল প্রোগ্রাম’-এর তথ্য বলছে, পতঙ্গবাহিত রোগের ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। গত বছর এ রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা গত পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ ছিল।

বংশবিস্তারের পক্ষে আদর্শ। কিন্তু মনুষ্যকৃত কারণটিও কম দায়ী নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্ষাকালেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং ত্রুটিপূর্ণ নিকাশির কারণে জল জমার সমস্যা কলকাতার মতো শহরাঞ্চলের চিরন্তন। উপরন্তু প্লাস্টিক জমে নিকাশির মুখগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা অচিরেই মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়। পতঙ্গবাহিত রোগাক্রমণ ঠেকাতে এই দিকগুলি নিয়ে নতুন করে ভাবা প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনে প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে নিকাশিব্যবস্থার কিছুটা হাল ফেরানো উচিত ছিল। তা হয়নি। তা ছাড়া, পতঙ্গবাহিত রোগ সম্প্রতি ক্যালেন্ডার মেনে হানা দেয় না। পরিবর্তিত আবহাওয়ায় সারা বছরই প্রায় এই রোগের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। সুতরাং, মরসুমি সরকারি উদ্যোগে এই রোগ প্রতিহত করা অসম্ভব। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বারংবার সারা বছর ডেঙ্গি দমন কর্মসূচি পালনের উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য যে সার্বিক এবং সুষ্ঠু কার্যকর পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল, তা এখনও দেখা যায়নি। ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গের ডেঙ্গি সংক্রমণই তার প্রমাণ।

পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ হিসাবে প্রশাসনের তরফে প্রায়শই জনগণের অ-সচেতনতার কথা শোনা যায়। নিঃসন্দেহে তা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। কিন্তু প্রশাসনও কি যথেষ্ট সচেতন? ইতিপূর্বে মশার আঁতুড়ঘর চিহ্নিত করতে ড্রোন ওড়ানো হয়েছে। ফাঁকা জমিতে আবর্জনা জমে থাকলে নির্মাণের অনুমোদন না দেওয়ার শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোনওটিই যথেষ্ট প্রমাণিত হয়নি। বস্তুত এই বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপগুলির তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিহত করার জন্য পৃথক প্রশিক্ষিত বাহিনী গড়ে তোলা, যাঁরা সারা বছর বাড়ি বাড়ি ঘুরে মশার আঁতুড়ঘর ধ্বংস এবং জ্বরের রোগীর তথ্য সংগ্রহের কাজটি করবেন। জনস্বাস্থ্যের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদেরও বিভিন্ন পুরসভা, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি-সহ বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করতে হবে। এ কথা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভারতে এই কাজটি এখনও সবিশেষ অবহেলিত। নিয়মিত কর্মী ছাড়া পতঙ্গবাহিত রোগের ক্ষেত্রে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অন্য দফতর থেকে কর্মী এনে পরিস্থিতি সামলানো নির্বুদ্ধির পরিচায়ক। ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া নিয়ে দীর্ঘ দিন ঘর করা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সে কথা বুঝবে কবে?

WB Madhyamik exam 2023 প্রদীপের নীচে

যে অন্ধকারের বাস প্রদীপের ঠিক তলাটিতেই, তার দিকে নজর পড়ে না তত, সকলে ব্যস্ত থাকেন আলোকশিখাটুকু নিয়েই। সে কারণেই হয়তো, এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে সবাই কথা বলছেন সেই বিষয়গুলি নিয়েই, প্রতি বছরই যা আলোচনায় ঘুরেফিরে আসে: মেধাতালিকা, প্রথম দশে থাকা ছাত্রছাত্রী-সংখ্যার বাড়বৃদ্ধি, জীবনসংগ্রামে যুঝে বহু পড়ুয়ার সাফল্য অর্জন এবং অবশ্যই কলকাতা ‘বনাম’ জেলাগুলির লড়াই। সমাজজোড়া আলাপ-আলোচনায় শেষোক্ত বিষয়টি প্রায় নিয়মে পর্যবসিত, কেমন করে পাশের হারে পূর্ব মেদিনীপুর, বা প্রথম দশে সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে মালদহ জেলা কলকাতাকে হেলায় হারাল, এই খবর যে গুরুত্বে উদ্ভাসিত, মোটেই সে ভাবে আলোচিত নয় এই মুহূর্তে রাজ্যের স্কুলগুলির বাস্তবচিত্র। কলকাতায় কত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী রাজ্য বোর্ডের স্কুলগুলিতে পড়ে, সিবিএসই-আইসিএসই স্কুলগুলির প্রতি অভিভাবকরা কেন বেশি ঝুঁকে থাকেন, বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলে জেলাগুলির জয়জয়কারের ব্যাখ্যা কি আসলে রাজ্য বোর্ডের উপর আন্তরিক নির্ভরতা, না কি অন্য বোর্ডের ব্যয়বহুল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের পড়াতে না পারার অপারগতা— এই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে বরং কথা হওয়ার ছিল। হয়নি।

এহ বাহ্য। এ বছরের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফলে একাধিক তথ্য-পরিসংখ্যান রীতিমতো অস্বস্তির। প্রথম শ্রেণিতে পাশ করেছে সমস্ত পরীক্ষার্থীর মাত্র ১৩.৬ শতাংশ, এই ধাক্কা কাটিয়ে না উঠতেই শিউরে ওঠার মতো তথ্য চোখের সামনে— ছয় লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ফেল করেছে এক লক্ষেরও বেশি! শুধু স্কুলশিক্ষা দফতরেরই নয়, সার্বিক ভাবে সমগ্র রাজ্য সরকারেরই এ বিষয়ে অবিলম্বে আলোচনায় বসার দরকার ছিল, প্রয়োজন ছিল আত্মসমীক্ষার: কেন মাধ্যমিকের ফলাফলে প্রদীপের নীচের অন্ধকার এত বেশি গাঢ়? ২০২০-২০২১ জুড়ে কোভিড-অতিমারির দাপট যে স্কুলশিক্ষায় দুরপনেয় দাগ রেখে গেছে তা আগেই প্রমাণিত; উঁচু ক্লাসের অজস্র ছাত্রছাত্রী স্কুলছুট হয়েছে, পরিবারের অন্ন-সংস্থানের কাজে লেগে পড়ায় বইখাতা ভুলতে বাধ্য হয়েছে, পরীক্ষার উপযুক্ত প্রস্তুতিটুকুও নিতে পারেনি। কিন্তু সরকারের তরফেও এমন সহমর্মিতা ও সক্রিয়তা চোখে পড়েনি যাতে কোভিড-উত্তর স্কুলশিক্ষায় এই বিরাট ক্ষতি পূরণ হয়।

শেক্সপিয়রের নাটকের অনুসরণে বলতে হয়, এ রাজ্যে কিছু একটা পচেছে। সেটি কী তা সকলেরই জানা, সামগ্রিক ভাবে স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থাটিই আজ এ রাজ্যে ধসের মুখে। অতিমারি থেকে লব্ধ জীবনশিক্ষাগুলি স্কুলশিক্ষায় তো কাজে লাগানো হয়ইনি, উপরন্তু সামনে এসেছে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে স্কুলশিক্ষক নিয়োগে সরকারের প্রবল দুর্নীতি। প্রায়োগিক স্তরে তার বিরুদ্ধপ্রভাব পড়েছে রাজ্য জুড়ে স্কুলগুলির দৈনন্দিন পরিচালনায়, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায়, ছাত্র ও শিক্ষক এবং শিক্ষক ও বৃহত্তর সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কে। এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল খতিয়ে দেখলে এই সব অভিঘাতই বিলক্ষণ বোঝা যাবে। অবশ্য খতিয়ে দেখবেই বা কে। পরীক্ষা নেওয়া ও ফল প্রকাশের চ্যালেঞ্জ উতরানো, সফল পরীক্ষার্থীদের নিয়ে মাতামাতিতেই সরকারের উৎসাহ, প্রদীপের তলার অন্ধকার ঘন হলেই বা কী।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM - https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Rabindra Sarobar Lake সরোবরের অসুখ

ফুসফুস যদি বিকল হয়, তবে শরীর কি সুস্থ থাকতে পারে? দক্ষিণ কলকাতার ‘ফুসফুস’ রবীন্দ্র সরোবর অঞ্চলটিকে ঘিরে পরিবেশপ্রেমীদের উৎকণ্ঠা তাই অমূলক নয়। ১৯০ একর জায়গা জুড়ে থাকা এই সরোবর নিছকই এক জলাশয় নয়। কংক্রিটের জঙ্গলের মাঝে সবুজে মোড়া এই চত্বর খানিক স্বস্তির শ্বাস নেওয়ার ঠিকানাও বটে। কিন্তু এই গ্রীষ্মে সেখানে জলস্তর যে উদ্বেগজনক ভাবে কমেছে, তা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। সরোবরের একাংশে চর পড়ে সেখানে ঘাস জন্মাতে দেখা গিয়েছে। কোথাও আবার জল শুকিয়ে বেরিয়ে এসেছে ঘাটের কাঠামো। গ্রীষ্মে জলাশয়ের জল শুকিয়ে যাওয়া কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। কিন্তু রবীন্দ্র সরোবরের মতো এক সুবিশাল জলাশয়, যাকে ঘিরে দীর্ঘ কাল ধরে এক অমূল্য বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠেছে, তার ক্ষেত্রে এমন পরিণতিকে নিছক ‘ঘটনা’ বলে অবহেলা করা চলে না। উদ্বেগ সঙ্গতই।

জলস্তর হ্রাসের একটি সম্ভাব্য কারণ হিসাবে উঠে আসছে সরোবরের চার পাশে ক্রমবর্ধমান বহুতলের সংখ্যা। এর কারণে মাটি থেকে যে বিপুল পরিমাণ জল তুলে নেওয়া হচ্ছে, তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে সরোবরের উপর। কারণটি গুরুত্বপূর্ণ, নিঃসন্দেহে। কিন্তু বহুতল নির্মাণ-সহ বিভিন্ন কারণে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের হ্রাস পাওয়া কলকাতার ক্ষেত্রে কোনও নতুন বিপদ নয়। দীর্ঘ দিনই কলকাতা, বিশেষত দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন ওয়র্ড জলস্তরের ক্ষেত্রে বিপন্ন তালিকার প্রথম সারিতে রয়েছে। সরোবর সংলগ্ন ওয়র্ডগুলিও তার বাইরে নয়। সুতরাং, শুধুমাত্র বহুতল নির্মাণকেই এই মরসুমে রবীন্দ্র সরোবরের শুকিয়ে আসার জন্য কতটা দায়ী করা চলে, তা নিয়ে আরও বিশদ ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। বস্তুত, সরোবরের জল শুকিয়ে আসার জন্য কোনও একটিমাত্র কারণকে দায়ী করা হয়তো অতি সরলীকরণ। এই মরসুমে গ্রীষ্মের চরিত্র বদলের ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য। নজিরবিহীন শুষ্ক গরমে জল অতিরিক্ত বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ায় এবং তদনুপাতে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় সরোবর শুকিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। উষ্ণায়নের আবহে জলাশয়গুলির ক্ষেত্রে এমত ঘটনা যে নিয়মিতই ঘটতে থাকবে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু আগেই সতর্ক করেছিলেন। তা ছাড়া সরোবরে পলি নিষ্কাশনের কাজটি হয়তো যথাযথ হয়নি। সে ক্ষেত্রে পলি জমে চরের জেগে ওঠাও সম্ভাব্য কারণ হতে পারে কি না, খতিয়ে দেখতে হবে সেটিও। হয়তো এমন বহুবিধ কারণের সম্মিলিত ফলই সরোবরের জলস্তর হ্রাস।

কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, তার জলাশয়গুলিরও বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। অথচ, এই বিষয়ে প্রশাসন এবং নাগরিক সমাজ— উভয়েই আশঙ্কাজনক ভাবে উদাসীন। রবীন্দ্র সরোবর আগেও একাধিক বার বিপন্ন হয়েছে। ইতিপূর্বে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ছটপুজোর কারণে ঘটা সরোবর-দূষণ রুখতে ব্যর্থ হয়েছিল প্রশাসন। কলকাতার অন্য জলাশয়গুলির অবস্থাও তথৈবচ। এক দিকে প্রোমোটার চক্রের দৌরাত্ম্যে জলাশয়গুলি রাতারাতি উধাও হচ্ছে, অন্য দিকে নাগরিকরাও কখনও জঞ্জাল, কখনও প্লাস্টিক ফেলে জলাশয়কে বুজিয়ে দিচ্ছেন, পুজোর সামগ্রী ফেলে জলকে দূষিত করছেন। রবীন্দ্র সরোবরকে নিঃসন্দেহে বাঁচাতে হবে। কিন্তু অন্য জলাশয়গুলির ক্ষেত্রেও যেন একই পথে ভাবনাচিন্তা হয়। সজাগ হতে হবে নাগরিককে, দায়িত্ব অবশ্যই প্রশাসনের।

Lift অ-রক্ষিত

কিছু ঘটনার অভিঘাত এমনই তীব্র যে, তা সার্বিক ভাবে দীর্ঘ দিন লুকিয়ে থাকা ত্রুটি-বিচ্যুতির জায়গাগুলিকে নিমেষে উন্মুক্ত করে দেয়। কসবার নার্সিংহোমে লিফ্‌ট দুর্ঘটনাটিকে অনেকটা সেই গোত্রেই ফেলা যায়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা চিকিৎসকের। গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর চিকিৎসক স্বামী। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই চার তলা থেকে লিফ্‌টটি ছিঁড়ে পড়ে। অথচ, লিফ্‌টি পুরনো নয়, মাত্র বছর দুয়েক আগেই সেটি বসানো হয়েছে। কিন্তু তার পর থেকেই একাধিক বার তাতে সমস্যা দেখা দেয়। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে লিফ্‌ট সারানোর সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সুযোগ আর পাওয়া গেল না। এত বড় যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটে কী ভাবে? তবে কি লিফ্‌ট বসানোর সময়ই তা যথাযথ পদ্ধতি মেনে সম্পন্ন হয়নি?

প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কলকাতা শহরে এটি একটি বিরাট সঙ্কটে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পুরনো সরকারি ভবনে ও হাসপাতালে লিফ্‌ট-এর কী দশা, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। বিস্ময়কর ভাবে, নতুনগুলিতে অবস্থা যেন আরও খারাপ। অনেকেই লিফ্‌টে ওঠার সময় প্রতি বার জীবনভয় জয় করে তবেই পা ফেলেন। সাম্প্রতিক কালে কলকাতা শহর জুড়ে তৈরি হওয়া অজস্র বহুতলে ওঠা-নামার জন্য লিফ্‌টই একমাত্র ভরসা। বিশেষত, প্রবীণ এবং অসুস্থদের জন্য তো বটেই। প্রায়শই ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতি ছাড়াই সেগুলি চলাচল করে। এই শহরেই গত দু’মাসে দু’বার লিফ্‌ট বিপর্যয় ঘটেছে। গত এপ্রিলে পার্ক স্ট্রিটের একটি বহুতল আবাসনে লিফ্‌ট ভেঙে মৃত্যু হয় এক নিরাপত্তারক্ষীর। লিফ্‌টে তিন ঘণ্টা আটকে থাকার মতো ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু সার্বিক ভাবে এই যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার এবং তাকে ‘সুস্থ’ রাখার ক্ষেত্রে টনক নড়েছে কি? নিয়ম অনুযায়ী, লিফ্‌ট লাগানোর ক্ষেত্রে পুরসভা এবং বিদ্যুৎ দফতরের অনুমতি নিতে হয়। এবং লিফ্‌ট লাগানোর পর ‘ফিট সার্টিফিকেট’ রাখাও বাধ্যতামূলক। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিয়ম পালন যথাযথ হয় কি?

শহরজীবন যদি কোনও নাগরিক সমাজের সভ্যতা-মানের চিহ্নক হয়, তবে লিফ্‌ট নামক বস্তুটির রক্ষণাবেক্ষণকে কিন্তু ন্যূনতম নাগরিক সুরক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ফেলতে হবে। শুধু লিফ্‌ট নয়, যে কোনও বহুতলের ক্ষেত্রেই আপৎকালীন ব্যবস্থাগুলির প্রতি নিয়মিত নজরদারি এবং রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি বলে স্বীকার করতে হবে। এবং সরকারি বেসরকারি সমস্ত বাড়ির ক্ষেত্রেই নগর-প্রশাসনকে শেষ পর্যন্ত সেই দায় গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবে দেখা যায়, বড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলে এই দিকগুলি অবহেলিতই থেকে যায়। অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রগুলি ধুলোয় ঢাকা পড়ে থাকে, ‘ফায়ার এসকেপ’-এর সিঁড়িতে জমতে থাকে বাতিল জিনিসের স্তূপ, পুরনো বাড়িতে যত্রতত্র বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে থাকে তারের জঞ্জাল। অথচ এগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে বাসিন্দা এবং ব্যবহারকারীর জীবনের প্রশ্নটি জড়িয়ে থাকে। ফলে, এগুলি সংস্কারের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা, শরিকি বিবাদ-সহ কোনও অজুহাতই যথেষ্ট হতে পারে না। নির্ভরযোগ্য সংস্থাকে দিয়ে এগুলি বসানো এবং নিয়মিত প্রশিক্ষিত কর্মীদের দিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরীক্ষা জরুরি। অন্যথায়, এমন দুর্ঘটনার সংখ্যাবৃদ্ধি সময়ের অপেক্ষামাত্র।

Old and Damaged Houses আর কত অপেক্ষা:

অভ্যাস, সে যতই বিপজ্জনক হোক না কেন, কিছু মানুষ সহসা তার সঙ্গ ছাড়তে চান না। সু-যুক্তি দিলেও কর্ণপাত না করে নিজের বিপদ বাড়ান, অন্যদেরও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ান। উদাহরণ হিসাবে পুরনো, বিপজ্জনক বাড়িতে বাস করার অভ্যাসটির কথা বলা যায়। সম্প্রতি যেমন ঘূর্ণিঝড়ের আবহেও তাঁরা নিজ বিপজ্জনক আস্তানাটি ছেড়ে অন্যত্র গমনে অনিচ্ছা দেখিয়েছেন। এই অনিচ্ছা এবং গা-জোয়ারি মনোভাব দীর্ঘ দিনের। পুর প্রশাসনের দাবি, বার বার আইন পাল্টেও পুরনো বাড়ি আঁকড়ে থাকার রোগের পরিবর্তন হয় না। ফলে, প্রতি ঝড়বৃষ্টি, বর্ষার আগমন বার্তায় দুশ্চিন্তা বাড়ে প্রশাসনের। বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটি বর্তায় তাঁদের উপর। এ বছরও যে তার অন্যথা হবে না, মরসুমের প্রথম ঝড়বৃষ্টির আগমনবার্তাতেই তার ইঙ্গিত মিলেছে।

বিধিবহির্ভূত বাড়ি নির্মাণ এবং তার বিপদ বিষয়ে আগেই এই সম্পাদকীয় স্তম্ভে (অবৈধ নির্মাণ, ১০-৫) আলোচনা হয়েছে। তবে নতুন নির্মাণের সঙ্গে পুরনো বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে মৃত্যুর সংখ্যাও বড় কম নয়। গত বছর বর্ষায় দু'টি বাড়ি ভেঙে দু'জনের মৃত্যুর খবর মিলেছিল। বছর কয়েক আগে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটেও বাড়ি ভেঙে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এ সমস্যার গোড়া অনেক গভীরে। বহু ক্ষেত্রে ভাড়াটেদের দাপটে মালিকই বাড়িতে ঢুকতে পারেন না। ফলে, সংস্কার নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি অব্যাহত থাকে। অনেক বাড়ির ক্ষেত্রে শরিকি বিবাদও সংস্কার না হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সংস্কার-বর্জিত বাড়িগুলি বাসিন্দা এবং পথচারীদের বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। গত বছর জানা যায়, বিপজ্জনক বাড়ি ছেড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 'পজ়েশন সার্টিফিকেট' দেবে পুরসভা, যাতে তাঁদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। প্রশ্ন হল, সে কাজ কত দূর অগ্রসর হয়েছে? পুরনো বাড়ির ক্ষেত্রে পুর আইনের ৪১২ (এ) ধারা অনুযায়ী, বিপজ্জনক বাড়ি ঘোষণা করে পাঠানো নোটিসকে 'কনডেমড' নোটিস বলে ধরা হবে। মালিককে সেই বাড়ি ভেঙে নতুন করে নির্মাণের সুযোগ দেওয়া হবে। মালিক সেই কাজ করতে না পারলে দায়িত্ব নেবে পুরসভা, খরচের ভার মালিকের। কিন্তু এতেও বিশেষ লাভ না হওয়ায় নতুন করে সংশোধনীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভাবনাচিন্তা চলছে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে পুরনো বাড়ি সংস্কারেরও।

কিন্তু এতবিধ প্রশাসনিক উদ্যোগ সত্ত্বেও কী করে বছরের পর বছর বাড়িগুলি জীর্ণতর হতে থাকে, সেই প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন। বিপজ্জনক বাড়ির বাসিন্দাদের নিজস্ব কিছু দাবিদাওয়া আছে। সর্বাগ্রে, সেই দিকগুলি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের আলোচনায় সমাধানসূত্র বার করা হোক। কিছু বছর আগে মহারাষ্ট্রের ঠাণে পুর নিগম সেই শহরের বিপজ্জনক বাড়ি খালি করে তা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাড়ি থেকে বলপূর্বক বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা গণতান্ত্রিক দেশে কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ নয়। কিন্তু প্রশ্ন যখন অনেক নিরীহ প্রাণের, তখন প্রশাসনিক কড়া অবস্থান অবশ্যই বিবেচ্য। বাসিন্দাদেরও সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন পূর্ণ সহযোগিতা করা। উষ্ণায়নের প্রেক্ষাপটে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূমিকম্পের আশঙ্কাটিও উড়িয়ে দেওয়ার নয়। এমতাবস্থায় কলকাতার বাড়ি ও তার বাসিন্দাদের সুরক্ষার প্রশ্নে নাগরিকের শুভবুদ্ধির ভরসায় বসে থাকার দিন ফুরিয়েছে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Illegal Construction অবৈধ নির্মাণ

অবৈধ ভাবে নির্মীয়মাণ একটি বাড়ির উঁচু তলা থেকে দড়ি ছিঁড়ে পড়া লোহার রড বিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন এক কলেজ-পড়ুয়া তরুণ। তাঁর পরিবার সন্তানের অকালমৃত্যুর জন্য কলকাতা পুরসভাকে দায়ী করেছেন। তাঁরা ভুল করেননি। এমন ঘটনার পরে পুরসভার গৃহ-নির্মাণ দফতরের প্রধান তো বটেই, মেয়রেরও দায় স্বীকার করা, এবং প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করারই কথা। কিন্তু শহরের নাম কলকাতা, দেশের নাম ভারত। এখানে দায়িত্বের সঙ্গে দায়বদ্ধতার সম্পর্ক ক্ষীণ। বরং উল্টোটাই সত্য— রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সকল দায়মুক্তির পাসপোর্ট হিসাবে দেখতেই অভ্যস্ত এ দেশের নেতারা। কখনওসখনও জনসংযোগের খাতিরে প্রশাসনিক সক্রিয়তার পরিচয় দিতে যান কর্তারা। তখন নানা করুণ কৌতুকের অভিনয় হয়। যেমন, মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাঁর ‘টক টু মেয়র’ প্রকল্পে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ পেয়ে গত বছর পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের কর্তাদের এবং পুলিশকে দায়ী করেন। যদিও পুরপ্রধান হিসাবে বিল্ডিং বিভাগও তাঁরই অধীনে, অতএব নিষ্ক্রিয়তার দায়ও তাঁর উপর বর্তায়। যে কোনও দুর্নীতি, অপদার্থতার দায় অধস্তন আধিকারিকদের উপর চাপিয়ে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা এ রাজ্যের নেতাদের একটি পরিচিত কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে পরিস্থিতি শুধরোয় না, কলকাতার কিছু ওয়র্ডে অবৈধ নির্মাণ প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। মৃত যুবকের বাড়ি যেখানে ছিল, সেই ৯ নম্বর বরোর অন্তর্গত একবালপুর, ওয়াটগঞ্জ এলাকায় অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ ভূরি ভূরি। অতএব কলেজ-পড়ুয়া জাকির আলির মৃত্যুকে নিছক দুর্ঘটনা বলে মেনে নেওয়া কঠিন। অবৈধ নির্মাণের চক্র যাঁরা অপ্রতিহত রেখেছেন, এ মৃত্যুর দায় তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না।

যে কোনও অবৈধ কারবার কেবল একটি আইনের লঙ্ঘনে সীমাবদ্ধ থাকে না। তার চার পাশে একটা দুষ্টচক্র গড়ে ওঠে, যা আইন, বিধি, প্রচলিত রীতিনীতিকে নস্যাৎ করে দেয়। চোলাইয়ের ঠেক মেয়েদের হয়রানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অবৈধ ইট ভাটা দাসশ্রমের ঘাঁটি হয়ে ওঠে। অবৈধ নির্মাণও এর ব্যতিক্রম নয়। কেবল যে নিয়ম ভেঙে বাড়ির অতিরিক্ত তলা তৈরি হয়, বা পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তৈরি হয়, তা-ই নয়। নির্মাণের পুরো প্রক্রিয়াটিই বিধির ধার ধারে না। যে ভাবে দড়িতে বেঁধে লোহার রড তোলা হচ্ছিল ওয়াটগঞ্জের ওই বাড়িটিতে, তা নিরাপত্তাবিধি নস্যাৎ করার একটি মারাত্মক দৃষ্টান্ত। এর খেসারত দিতে হয় নির্মাণ-শ্রমিকদেরও।

একই সঙ্গে পথচারী এবং বাইক আরোহী, গাড়ি আরোহীদের বিপন্নতাও বাড়ে। রাস্তার মাঝখানে ইমারতি দ্রব্য ফেলে রাখা কলকাতা তথা সারা রাজ্যেই অতি পরিচিত দৃশ্য। অতি সঙ্কীর্ণ পথেরও আধখানা জুড়ে বালি, পাথরের স্তূপ যাতায়াতকে ঝুঁকিপূর্ণ এবং মন্থর করে তোলে, দুর্ঘটনা ঘটায়। বৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রেও অবৈধ ভাবে ফুটপাত ও রাস্তার ব্যবহার নিয়ম হয়ে উঠেছে। এই সব বিধিভঙ্গের মূল যে প্রোথিত রয়েছে অসাধু আঁতাঁতে, তা কারও অজানা নয়। এক দিকে ‘প্রোমোটিং’ অন্য দিকে ‘সিন্ডিকেট’ ব্যবসা গড়ে উঠেছে, দু’টিই চলছে রাজনৈতিক প্রশ্রয়ের ছত্রছায়ায়। নির্মাণকে ঘিরে বিধিভঙ্গ যত প্রকট, ততই প্রতিকারহীন— নাগরিকের মৃত্যুও এই দুষ্টচক্রকে আঘাত করতে পারে না। আইনের শাসনের ধারণাকেই প্রহসন করে তুলছে অবৈধ নির্মাণ।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Artificial Intelligence অনিশ্চয়তার নতুন পর্ব

ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন থেকে চোখে আঙুল দাদা— নিজের উদ্ভাবনের ভয়াল পরিণতি দর্শনে বিব্রত বা বিপর্যস্ত হয়ে পড়া স্রষ্টাদের তালিকাটি দীর্ঘ। কেবল সাহিত্যে নয়, জীবনেও— পারমাণবিক বোমা থেকে শুরু করে পেপার স্প্রে পর্যন্ত নানা আবিষ্কারের মুখোমুখি হয়ে তাদের স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্মের অগ্রদূতেরা স্তম্ভিত বা মর্মাহত হয়েছেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। জেফ্রি হিন্টন এই তালিকায় নবতম সংযোজন। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবক হিসাবে বন্দিত এই আমেরিকান প্রযুক্তি-বিজ্ঞানী সম্প্রতি জানিয়েছেন এক গভীর আশঙ্কার কথা। তাঁর অনুমান, এআই-এর ভিত্তিতে তৈরি ‘চ্যাটবট’ অর্থাৎ কথোপকথন চালানোর রোবটগুলি অচিরেই মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এমন বিপদ সৃষ্টির পিছনে নিজের ভূমিকার জন্য তিনি অনুতপ্ত। ইতিমধ্যে প্রযুক্তি-বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংস্থার উচ্চপদও ছেড়ে দিয়েছেন ৭৫ বছর বয়সি হিন্টন। তাঁর মন্তব্য ও পদক্ষেপ নিয়ে এই মুহূর্তে দুনিয়া জুড়ে বিপুল শোরগোল উঠেছে।

শোরগোল অস্বাভাবিক নয়। এআই এবং চ্যাটবট নিয়ে সাম্প্রতিক কালে যে বিপদগুলির কথা সবচেয়ে বেশি শোনা গিয়েছে, হিন্টনও জোর দিয়েছেন সেগুলির উপরেই। প্রথম বিপদের নাম ভুয়ো তথ্য। অশুভ উদ্দেশ্যে মিথ্যাকে সত্য বলে চালানোর তৎপরতা গত কয়েক বছর ধরে অস্বাভাবিক মাত্রায় পৌঁছেছে, তার ফলাফলও অনেক সময়েই সমস্ত বিপদসীমা ছাড়িয়ে বিধ্বংসী আকার নিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সত্যপুচ্ছধারী মিথ্যার উৎপাদন এবং প্রসার কেবল সহজ নয়, অকল্পনীয় রকমের শক্তিশালী হতে পারে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-পরিসংখ্যান ‘চুরি’ করে এবং অর্থব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোর প্রযুক্তি-শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা। এই ধরনের সম্ভাব্য বিপদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হিন্টন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পুতিন এবং তাঁর রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপ সত্যই আশঙ্কার কারণ, তবে দুনিয়ার অন্যত্র, হিন্টনের আপন দেশেও, ক্ষমতাবানের হাতে প্রযুক্তির অপব্যবহার কী মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করতে পারে, তার দৃষ্টান্তও এই গ্রহের অধিবাসীদের অজানা নয়।

সম্ভাব্য অন্য বিপদটি ঈষৎ ভিন্ন গোত্রের। তা হল কর্মচ্যুতির আশঙ্কা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অনেক ধরনের কাজে যন্ত্রমানবকে মানুষের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে চলেছে। চ্যাটবট এই পরিবর্তনের মাত্রা এবং ব্যাপ্তি দুই-ই বাড়িয়ে তুলতে পারে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থায় তেমন উদ্যোগ শুরু হয়েছে— একটি অতিকায় প্রযুক্তি সংস্থার কর্ণধার জানিয়েছেন যে, সেখানে আগামী পাঁচ বছরে এআই ব্যবহার করে প্রায় আট হাজার কর্মীর কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। সমস্যাটি এক অর্থে প্রাচীন। মানুষের কাজ যদি যন্ত্র তথা প্রযুক্তি করে দিতে পারে, তা হলে কাজের সুযোগ কমে— বহু কাল ধরেই এই প্রক্রিয়া চলে আসছে। কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার বন্ধ করা হয়নি, করার যুক্তিও নেই। কোনও একটি বা এক ধরনের কাজে মানব-কর্মীর প্রয়োজন কমলেও সামগ্রিক ভাবে অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীর চাহিদা বেড়েছে, প্রযুক্তির কল্যাণে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, দেশের সমৃদ্ধি হয়েছে। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে— এই প্রযুক্তি কী ভাবে এবং কত দ্রুত অগ্রসর হবে, তার ফলে কর্মীর চাহিদা ও ভূমিকা কোথায় কতটা বদলাবে, তা একেবারেই স্পষ্ট নয়। হিন্টন বলেছেন, এআই তার বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে মানুষের মস্তিষ্ককে অতিক্রম করতে পারে। এই সম্ভাবনা আক্ষরিক অর্থেই অ-পূর্ব, এবং তার তাৎপর্য স্পষ্টতই সুদূরপ্রসারী। তাঁর আশঙ্কা কত দূর বাস্তবসম্মত, সে বিষয়ে তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু আশঙ্কাটি উড়িয়ে দেওয়ার কোনও উপায় নেই।

Enforcement Directorate নিরপেক্ষ

তাদের কোনও রাজনৈতিক রং নেই, বিশেষ সিবিআই আদালতে দাঁড়িয়ে জানাল ইডি। মুখের কথা নয়, একেবারে ভগবদ্‌গীতার শ্লোক উদ্ধার করে ইডি-র প্রতিনিধি জানিয়েছেন, কর্মেই তাঁদের অধিকার, ফলে নয়। দুর্জনে বলতে পারে, কথাটি তিনি মিথ্যা বলেননি— ইডি, আয়কর দফতর বা সিবিআই-এর মতো প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করা হলে তার সুফল তো আর দফতর পায় না, ব্যবহারকারীরাই পান। কিন্তু, দুর্জনের কথা থাক। ভারতবাসী বরং নিজেদের অসীম দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে পারে— দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইনরক্ষক প্রতিষ্ঠানকে আদালতে দাঁড়িয়ে নিজেদের নিরপেক্ষতার দাবি করতে হচ্ছে! প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা কতখানি কমলে এই পরিণতি হতে পারে, তা ভেবে সুতীব্র লজ্জা বোধ হয়। আপাতদৃষ্টিতে দাবিটি অন্তঃসারশূন্যও বটে। শুধু ইডি নয়, কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির তদন্তের অভিমুখ যে ভাবে মূলত বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা, কেন্দ্রীয় সরকারের অকুণ্ঠ প্রশস্তিতে নারাজ সাংবাদিক বা নাগরিক সমাজের প্রশ্নশীল অংশের দিকে থেকেছে, তাতে কারও মনে হতেই পারে যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা নয়, সংস্থাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হয়তো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। মনে হতেই পারে যে, সংস্থাগুলি ক্ষমতাসীন দলের হয়ে বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনের কাজ করছে। পূর্ববর্তী জমানায় এক বিচারপতি সিবিআই-কে খাঁচার তোতা বলে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই খাঁচায় বন্দি টিয়ার সংখ্যা বেড়েছে তো বটেই, কারও মনে হতেই পারে যে, ইদানীং আর খাঁচারও প্রয়োজন পড়ছে না— টিয়াগুলি স্বেচ্ছাবন্দি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলবেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলা বর্তমান শাসনের অভিজ্ঞান। প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষে রয়েছেন যাঁরা, তাঁদের রাজনৈতিক আনুগত্য গোপন থাকেনি। কেউ বলতেই পারেন যে, শুধু তদন্তকারী সংস্থাই নয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিসরের কার্যত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই বর্তমানে আনুগত্যের যুক্তিতে পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ক্রিস্তাফ জাফ্রেলো প্রতিষ্ঠানকে দখল করার এই প্রক্রিয়াটিকে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর প্রকল্পের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে দাবি করেছিলেন। স্বল্প বা মাঝারি মেয়াদে বিরুদ্ধ স্বর দমনের কাজে ব্যবহৃত হবে প্রতিষ্ঠানগুলি; কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা পরিচালিত হবে এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধারণাসঞ্জাত আধিপত্যবাদের যুক্তিতে, এবং তার শাসনের পরিসরে অন্য কোনও যুক্তির, ধারণার বা দাবির বৈধতা থাকবে না। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে এমন হেজেমনির গুরুত্ব বিপুল।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক প্রকল্পের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য জরুরি, কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে তা মারাত্মক। তার প্রধানতম কারণ, ভারত নামক ধারণাটির মূল চালিকাশক্তি সর্বজনীন, গ্রহণশীল, উদারবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা। রাষ্ট্রীয় স্তরে সেই চালিকাশক্তি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কল্পনার অন্তর্গত হওয়াই যথেষ্ট নয়, প্রশাসনিক স্তরগুলিতেও তা সমান ভাবে প্রসারিত হওয়া জরুরি। বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন ক্ষমতায় যাঁরা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড নির্বাহ করেন, তাঁরা যদি প্রকৃত উদারবাদে বিশ্বাসী না হন, তবে হাজার রাজনৈতিক সদিচ্ছাও ভারতের ধারণটিকে রক্ষা করতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা তাঁর রাজনৈতিক জয়রথটিকে আজ যাঁর যতখানিই অদম্য বোধ হোক না কেন, বৈশ্বিক ইতিহাস সাক্ষী যে, কোনও শাসকের দাপটই চিরস্থায়ী হয়নি। কাল না হোক পরশুর পরের দিন ভারতেও শাসক পাল্টাবেই। কিন্তু, প্রশাসনের মজ্জায় যদি ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সংখ্যাগুরুবাদের মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে বারংবার খর্ব হবে ভারতের আত্মা। অতএব, সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা বিষয়ে প্রতিটি নাগরিকের ঘোর দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER

Practice Paper –live practice 9.30pm

Fees : 100 / month

- **বাড়ি থেকে পরীক্ষা -*প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে -*pdf করে লিখে পাঠাতে হবে। সপ্তাহে সোমবার ও শুক্রবার

print করে খাতা দেখা হবে । খাতা দেখার পর মোডেল উত্তরপত্র দেওয়া হবে ।লেখাগুলো 7047352328 নাম্বারে পাঠাতে হবে

- বেতন :₹ 100 টাকা প্রতিমাস ।
- WhatsApp : 7047352328

WHATSAPP -7047352328